সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ›› তৃতীয় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ›› সেপ্টেম্বর ২০১৭ ›› পাঁচ টাকা

মানবকল্যাণে সোভিয়েতের দান
পৃষ্ঠা ৩

বন্যার্তদের জন্য ছাত্র ফ্রন্টের ‘স্যালাইন প্রজেক্ট’
পৃষ্ঠা ৪

এ সমাজে নারীর অবস্থান কোথায়?
পৃষ্ঠা ৮

বার্লিন সম্মেলন
পৃষ্ঠা ৮

প্রাণভয়ে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে

এই গণহত্যা বন্ধ কর

রোহিঙ্গাদের নিয়ে এ সময়ে যা যা ঘটেছে তার ভয়াবহতার বিবরণ দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। পত্র-পত্রিকা ও টিভি মিডিয়ার মাধ্যমে এ খবর এখন সারাদেশের মানুষ জানেন। জাতিসংঘের ধারণা, এ পর্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। এখনও মানুষের ঢল বন্ধ হয়নি।

রোহিঙ্গারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী নয়। এরা বেশি সুবিধার আশায় এদেশে ঢুকতে চাইছে – ব্যাপারটা এমনও নয়। তারা প্রাণরক্ষার জন্য এদেশে আশ্রয় চাইছে। তাদের আশ্রয় দেয়া সরকারের মানবিক কর্তব্য। তাদের সাহায্য করা এদেশের মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। কোনো স্বাধীন দেশের মানুষ, কোনো মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি এ দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। মিয়ানমারে যা হচ্ছে তা হলো গণহত্যা। এটা কোনো সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ নয়। সরকার পরিকল্পনা করে তার বাহিনী দিয়ে এই জনপদের মানুষকে গণহারে হত্যা করছে, তাদের ঘরের মেয়েদের ধর্ষণ করছে, নির্যাতন করে করে তিল তিল যন্ত্রণা দিয়ে মারছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। দেশের সাধারণ জনগণ এ ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারে না, তা নয়। জাতি হিসেবে এরকম গণহত্যা ও নির্যাতনের মুখোমুখি আমরাও হয়েছিলাম। আমরা কি সে কথা ভুলে যেতে পারি? আমাদের কি এ সময়ের কর্তব্য ঠিক করতে বিতর্ক করতে হবে? এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর প্রবন্ধ থেকে একটা ছোট অংশ আমরা উল্লেখ করতে চাই। প্রবন্ধটি গত ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে ‘দৈনিক প্রথম আলো’ পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন, *(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়ের প্রতিক্রিয়ায়

সরকারের কর্তৃত্বকারী ভূমিকার নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে

একসময় এ ভূখণ্ডে রাজাদের শাসন ছিল। রাজা ছিলেন সর্বশক্তিমান, তিনিই ছিলেন রাষ্ট্র। তার ইচ্ছার ভিত্তিতে সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে বলে মনে করা হতো। প্রকৃতি যেমন ঈশ্বর পরিচালনা করেন, তেমনি সমাজ পরিচালনা করেন তিনি। রাজাকে সবদিক থেকে পূজনীয় করে তুলতেন ধর্মীয় নেতারা। মানুষকে তারা বোঝাত রাজা হলো ‘ঈশ্বরের প্রতিনিধি’। ঈশ্বরের যেমন কোনো ভুল নেই তেমনি রাজাও কোনো ভুল করতে পারে না। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের গায়ে তাই একসময় খোদাই করা ছিল ‘King can do no wrong’। সময় পাল্টেছে, এমন চিন্তা-চেতনারও পরিবর্তন এসেছে। মানুষ নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়ে একসময় বুঝেছে এই ধারণাগুলো নেহাতই মিথ্যাচার – ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে কিছু নেই, মানুষ মাত্রই ভুল করে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে বোধহয় কথাগুলো এভাবে খাটে না! এখানে যখন যে ক্ষমতায় থাকে সেই শাসক আর তার দোসরদের কোনো ভুল হয় না, তাই সমালোচনাও করা যায় না। সমালোচনা করলে শাসকরা তা সহ্য করেন না। কেউ করলে তার জবাব ‘রাজা যত দেয় সভাসদ দেয় দশগুণ’। এখানে চারদিকে মোসাহেবদের ছড়াছড়ি। তারা বোঝাতে চায় ‘King can do no wrong’। কথাগুলো বলা হলো বাংলাদেশের সাম্প্রতিক একটি ঘটনা নিয়ে আলোকপাত করার প্রয়োজনে। সরকার সংবিধানের যে ১৬তম পরিবর্তন ঘটিয়েছিল তা গত ৩ আগস্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ কোর্ট সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বাতিলের রায় দেন। রায়ের পাশাপাশি প্রধান বিচারপতিসহ বিচারকগণ কিছু পর্যবেক্ষণ (Observations) রাখেন যাকে আইনের ভাষায় বলে ‘অবিটার ডিকটা’। ব্যস, আর যায় কোথায়? অমনি শুরু হয়ে গেল মোসাহেবদের তৎপরতা। রায় ভালো করে না পড়লেও তাদের অনেকেই প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাকে ‘পাকিস্তানপ্রেমী’, ‘দালাল’, ‘সংখ্যালঘু’, ‘মনিপুরী’, ‘প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদে নিয়োগপ্রাপ্ত’ ইত্যাদি বলার পাশাপাশি তুই-তোকারী সম্বোধনও করলেন। কেউ বললেন ‘বিএনপির ষড়যন্ত্র আছে’, বা ‘একটি ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদক এই রায় লিখে দিয়েছেন’। কেউবা প্রধান বিচারপতির অপসারণ চাইলেন। একজন সাবেক প্রধান বিচারপতি নির্লজ্জ এবং নজিরবিহীনভাবে দুইবার সংবাদ সম্মেলন করে রায়ের সমালোচনা করলেন, শিল্প-সংস্কৃতি বেচে খান এমন সংস্কৃতিজীবীরা কালো পতাকা প্রদর্শন করলেন, ডাক্তার নেতারা বন্যার্ত মানুষদের পাশে না দাঁড়ালেও প্রেসক্লাবে বিশাল মানববন্ধন করলেন, হিন্দু নেতারা তাদের জাত গেল বলে রব তুললেন আর টেলিভিশন-পত্রিকায় ভাড়াখাটা বুদ্ধিজীবীরা প্রধান বিচারপতির চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করেই ছাড়লেন। কোথায় যেন হারিয়ে গেল দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় আর তার বিচারকের সম্মান!

রায় নিয়ে কেন এত তোলপার?

কী ছিল সেই ষোড়শ সংশোধনীর রায়ে কিংবা তার পর্যবেক্ষণে – যা নিয়ে এত তোলপাড়? মোসাহেবদের *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ভয়াবহ বন্যা
অথচ সরকার নির্বিকার!

ভয়াবহ বন্যায় এবারের ঈদের আনন্দ ঘুচে গেছে দেশের মানুষের। এবারের বন্যায় প্রায় সাড়ে ৫ হাজারের মতো গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে,৭৫ লক্ষ মানুষ ছিল পানিবন্দী, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৪ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সাড়ে ছয় লক্ষ হেক্টর জমির ফসল। প্রায় দেড়শত মানুষ মারা গেছে এ বন্যায়।

বন্যা কবলিত এলাকার মানুষ তাদের বাসস্থান হারিয়েছে, গৃহপালিত গবাদিপশু হারিয়েছে, হারিয়েছে বেঁচে থাকার অবলম্বন একটুকু ফসলি জমি। বন্যাদুর্গত মানুষ তাদের বাসস্থানের সাথে হারিয়েছে সারা বছরের সঞ্চিত খাদ্য, ঋণ পরিশোধের জন্য জমানো টাকা, গবাদি পশু, পুকুরের মাছ। অসংখ্য পরিবার বাঁচাতে পারেনি তাদের বয়স্ক এবং শিশু সদস্যটিকে। বন্যা শুরু হবার পরপরই ওই বন্যা কবলিত এলাকার প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ বাড়িঘর হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছে কখনও রেললাইনের উপর, কখনও কোনো উঁচু টিলায় অথবা কখনও খোলা আকাশের নীচে কলার ভেলায় দিনাতিপাত করেছে।

বন্যার পানি এখন নামতে শুরু করেছে। কিন্তু এতে কি সমস্যার সমাধান হবে? বাস্তবে মানুষের সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করবে। কারণ, বন্যায় আক্রান্ত পরিবারগুলো সর্বস্বান্ত হয়েছে। বাড়িঘর হারানো কৃষকেরা এখন ঘরবাড়ি ঠিক করবে কীভাবে, পরবর্তী চাষের প্রস্তুতি কিভাবে নেবে আবার ইতিমধ্যেই যে ঋণ তাদের আছে এনজিওগুলোর কাছে তার শোধই বা কি করে দেবে – এই ভয়ঙ্কর সঙ্কটে তারা পড়েছে। এই সঙ্কটের সমাধান না করতে পেরে একটা বড় সংখ্যার কৃষক গ্রামে যতটুকু জমি ছিল তা বিক্রি করে কাজের আশায় শহরে পাড়ি জমাবে। এরা সংখ্যায় এক-দু'জন নয়, লক্ষ লক্ষ। দলে দলে শহরে আসা এই লোকেদের জন্য শহরে কোন কাজ নেই। ফলে একদিকে শ্রম সস্তা হবে, অপরদিকে সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে ভীষণভাবে।

এর সামাজিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী। একটা বিরাট সংখ্যক কর্মক্ষম লোক বেকার হয়ে যাওয়া, ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে ঝরে পড়া, এক একটা জনপদ ধরে ধরে লোকেরা ঘর ছেড়ে রাস্তায় নামা – এটা শুধু ওই মানুষগুলোর বিষয় আর থাকেনা শেষ পর্যন্ত। ওই এলাকার অর্থনীতির উপরও তার প্রভাব পড়ে। ছোট ও মধ্য ব্যবসায়ীদের একটা অংশ উচ্ছেদ হবে। কাজ হারাবে ওইসব ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত থাকা কর্মচারি, দিনমজুরেরা। সব মিলিয়ে *(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সরকারের কর্তৃত্বকারী ভূমিকার নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে

(১ম পৃষ্ঠার পর) এত তৎপরতা? আসুন পাঠক এখন সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

১৯৭১ সালে আমাদের দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। তার প্রেক্ষিতে ১৬ ডিসেম্বর আসে আমাদের স্বাধীনতা। এর ঠিক এক বছর বাদে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমাদের সংবিধান প্রণীত ও কার্যকর হয়। এই সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে লেখা ছিল বিচার বিভাগ পৃথক করতে হবে। ১১৬ অনুচ্ছেদে বিচারকদের শৃঙ্খলা সুপ্রিম কোর্টের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল। আর ৯৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা ছিল জাতীয় সংসদের হাতে। ১৯৭৫ সালে দেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদিকে 'বাকশাল' কায়েম করেন, অন্যদিকে বিচারক নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে নিয়ে আসেন। এর পরবর্তীতে বাংলাদেশের আরেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা প্রধান বিচারপতি ও আরও দুইজন জ্যেষ্ঠ বিচারপতির দ্বারা গঠিত 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল'র হাতে ন্যস্ত করেন। ২০১৪ সালে ষোড়শ সংশোধনী করে এই বিধান পুনরায় জাতীয় সংসদের হাতে ফিরিয়ে নেয়া হয়। এখন বর্তমান রায়ের কারণে সেই সংশোধনী বাতিল হয়ে গেল। অর্থাৎ দেশের সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছেন, বিচারকরা যদি সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত হন, তবে তদন্ত করা ও তাদের অপসারণের জন্যে জাতীয় সংসদ নয় বরং সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ক্রিয়াশীল থাকবে।

রাষ্ট্রের তিনটি স্তম্ভ থাকে। আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উন্মেষের কালে বলা হয়েছিল, এই তিনটি বিভাগ পরস্পর থেকে আলাদা থাকবে এবং আপেক্ষিক স্বাধীনতা ভোগ করবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রবন্ধের পরে আলোচিত হবে। কিন্তু ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়ের মাধ্যমে বিচার বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ – বিচারক অপসারণের ক্ষমতা আইন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের হাতে চলে গেল। এতে সরকারপক্ষ নাখোশ হয়েছে। তাদের দেখাদেখি নাখোশ হয়েছে তাদের পোষা 'সুশীল' ব্যক্তিবর্গ। শুধু রায়ের কারণে নয়, সরকারের কর্তাব্যক্তিদের রাগ করার আরও কিছু কারণ আছে। আর সেটা আছে রায়ের পর্যবেক্ষণে, প্রধানত প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণে। খুব সংক্ষেপে বললে পর্যবেক্ষণগুলো দাঁড়ায় – ১. সংবিধান সুরক্ষার ভার সুপ্রিম কোর্টের হাতে। ২. জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সংসদ নয়। ৩. দেশের শাসনকার্যে 'আমিত্ব' প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। প্রয়োজন 'আমরাত্ব'। ৪. সবকিছুর ব্যক্তিকরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে একটি 'ভুয়া ও মেকি গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ৫. সংসদ একটি 'অকার্যকর' প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ৬. রাজনীতি এখন বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। ৭. ক্ষমতার অপব্যবহার ও দাম্ভিকতা দেখানোর ক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। ৮. নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়নি। ৯. গ্রহণযোগ্য নির্বাচনব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়নি এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ছাড়া গ্রহণযোগ্য সংসদ প্রতিষ্ঠা পায় না। ১০. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে সাংসদেরা দলের হাইকমান্ডের কাছে জিম্মি। ১১. সংসদ পঞ্চদশ সংশোধনী পাশের সময় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের নির্দেশনা মানেনি। ১২. রাষ্ট্রক্ষমতা সম্প্রতি গুটিকয়েক মানুষের একচ্ছত্র বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ১৩. সামরিক শাসকেরা ক্ষমতার দখলদার এবং তারা দু'বার দেশে সামরিক ব্যবসায়ী অভিজাত শ্রেণির যোগসাজশের শাসনব্যবস্থা (ব্যানানা রিপাবলিক) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৩. চতুর্থ সংশোধনী ছিল সংবিধান পরিপন্থী এবং তার মাধ্যমেই বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা রাষ্ট্রপতির কাছে ন্যস্ত করা হয়। ১৪. পঞ্চদশ সংশোধনীতে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার বিধান আপেক্ষিকভাবে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করেছে। ১৫. সামরিক শাসনের কণামাত্র সংবিধানে রাখা হয়নি – এমন দাবি অসার। কেননা সেক্যুলারিজম ও রাষ্ট্রধর্ম, বিসমিল্লাহ রহমানির রহিম একই সংবিধানেই আছে ইত্যাদি।

১৫৪টি সিটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে আর সবকিছুকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-এমপিদের স্বাভাবিকভাবেই এসব সমালোচনা ভালো লাগেনি। সংসদ অকার্যকর, গণতান্ত্রিকতার অভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর করেছে – এসব কথা তাদের ভালো লাগবে কেন? তাই তারা তারস্বরে এর প্রতিবাদ করছে। কেউ কেউ চূড়ান্ত অশ্লীল কথাও বলেছে। যদিও এখন পর্যন্ত কারও বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হয়নি। সবচেয়ে সমালোচনা হয়েছে প্রধান বিচারপতির একটি পর্যবেক্ষণ নিয়ে – 'কোনো এক ব্যক্তির দ্বারা দেশ বা জাতি তৈরি হয়নি।' এর মাধ্যমে নাকি শেখ মুজিবুর রহমানকে কটাক্ষ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো ৭৯৯ পৃষ্ঠার রায়ে শেখ মুজিবুর রহমান নামটি ইতিবাচক অর্থে ১১ বার আনা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জাতির জনক'ও সম্বোধন করেছেন। রায়ে কোথাও তাঁকে তো খাটো করা হয়নি। দেশের চলমান ব্যবস্থা নিয়েও প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকগণ কোথাও বিদ্রোহের কথা বলেননি, নিরঙ্কুশ আনুগত্যেরই প্রমাণ দিয়েছেন। আরেক আলোচনায় প্রধান বিচারপতি বলেছেন, 'এখানে রায় নিয়ে এত শোরগোল। অথচ পাকিস্তানে বিচার বিভাগের রায়ে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত পাল্টে গেল।' এ কথা বলার কারণে প্রধান বিচারপতি 'পাকিস্তানপ্রেমী' হয়ে গেলেন! একজন মন্ত্রী তাঁকে পাকিস্তানেই চলে যেতে বললেন। কেউ বললেন এর মাধ্যমে প্রধান বিচারপতি সরকারকেই উৎখাতের পরিকল্পনা করছে। আসলে

১৫৪টি সিটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে আর সবকিছুকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-এমপিদের স্বাভাবিকভাবেই এসব সমালোচনা ভালো লাগেনি। সংসদ অকার্যকর, গণতান্ত্রিকতার অভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর করেছে – এসব কথা তাদের ভালো লাগবে কেন?

জনগণের সমর্থন ছাড়া কেবল গায়ের জোরে ক্ষমতায় থাকলে সামান্য সমালোচনাতেই যে সরকারের ভিত কেঁপে ওঠে – এবারের ঘটনাতে তারই প্রমাণ পাওয়া গেল।

আরও কিছু কারণ

ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়ে জানা গেল সুপ্রিম কোর্টে যত মামলা আছে তার ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে সরকার একটি পক্ষ। মামলায় দুই পক্ষের কেউ হারতে চায় না – এটাই স্বাভাবিক। যদি উচ্চতর আদালতে সরকারের কর্তৃত্ব কমে যায় তবে এই মামলাগুলোর কী হবে? রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে যদি সরকার বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করে তবে নাগরিকদের ন্যায় বিচার পাবার সম্ভাবনা কম থাকে। এ কথার সত্যতাও পাওয়া যায়। নিয়ন্ত্রণ থাকলে কতটা প্রভাব ফেলা যায়- তা একটি পরিসংখ্যানে বোঝা যাবে। এই সময়ে সরকার দলীয় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বিচারাধীন প্রায় সাত হাজারের বেশি মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এসবের মধ্যে এমনকি খুনের মামলাও আছে। (*তথ্যসূত্র : দৈনিক প্রথম আলো*) এর ফলে বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন ৪৬ বছরেও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগবিধি তৈরি হয় না, কেন সরকার বিচারবিভাগকে তাদের হাতে রাখতে চায়।

সংবিধান সংশোধনী নিয়ে কিছু কথা

এ কথা সকলের জানা, সংবিধান সংশোধন করার এখতিয়ার কেবলমাত্র জাতীয় সংসদের। যেকোনো আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও ন্যস্ত থাকে সংসদের উপর অর্থাৎ আইন বিভাগের উপর। কেবল জাতীয় নির্বাচনকালীন সংসদ যখন স্থগিত থাকে তখন রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে নতুন আইন প্রণয়ন করতে পারেন। সংবিধানের ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা সংসদের হাতে দেয়া হয়েছে। জাতীয় সংসদের দুই তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধানের বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণ করা যায়। তবে এই ক্ষমতাটি নিরুঙ্কুশ নয়। সংবিধানের আরও কিছু ধারা দিয়ে এই ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। যেমন ৭(খ)-তে বলা হয়েছে, "সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোনো পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।" আবার ৭(২) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।" এবং মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের ২৬ (২) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র এই ভাগের কোনো বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য কোনো আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোনো আইন হইলে তাহা এই ভাগের কোনো বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।" অর্থাৎ সংবিধানের বিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ সমর্থন থাকলেও সংবিধানের সাথে বিরোধপূর্ণ (যার তালিকা সংবিধানে দিয়েছে) আইন বাতিল বলে গণ্য হবে।

এখানে আসে বিচার বিভাগের ভূমিকার দিকটি। আদালতের মাধ্যমেই সাধারণত বাতিলের কাজটি সম্পন্ন হয়। ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়টি তেমনই একটি রায়। আদালত বিবেচনা করে সংবিধানের কোনো সংশোধনী যদি সংবিধানের কোনো ধারার সাথে সাংঘর্ষিক হয় কিংবা মৌলিক কোনো কাঠামোর সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তখনই সেই সংশোধনী বাতিল করে। সংবিধানের 'মৌলিক কাঠামোগুলো' কী – এ সম্পর্কে অষ্টম সংশোধনীর মামলাসহ বিভিন্ন মামলার রায় ও পর্যবেক্ষণে বিচারক, অ্যামিকাস কিউরাবৃন্দ তুলে ধরেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে মৌলিক কাঠামোর (Basic Structure) কোনো তালিকা তৈরি করা যায়নি। তবে ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়ে আদালত 'বিচার বিভাগের স্বাধীনতা'কে মৌলিক কাঠামো হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সেই অনুযায়ী ষোড়শ সংশোধনী সংবিধানের ৯৪(৪) ও ১৪৭(২) নং অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করেছে।

অনুচ্ছেদ ৯৪(৪) এ বলা হয়েছে, "এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক বিচারকার্যপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।" এবং ১৪৭(২) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোনো পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির কার্যভারকালে তাঁহার পারিশ্রমিক, বিশেষ-অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্তের এমন তারতম্য করা যাইবে না, যাহা তাঁহার পক্ষে অসুবিধাজনক হইতে পারে।" অর্থাৎ আদালত বিবেচনা করেছে, ৯৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যদি বিচারক অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে থাকে তবে সংবিধানের আলোচ্য দুটি অনুচ্ছেদ ৯৪(৪) এবং ১৪৭(২) লঙ্ঘিত হয়। তাতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকে না। মূলত এই যুক্তিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ষোড়শ সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করেছে।

এখন প্রশ্ন আসে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কথাটির অর্থ কী? বিচার বিভাগ কতটুকু স্বাধীন? কার কাছে স্বাধীন? সব কিছুর দায়বদ্ধতা যদি জনগণের স্বার্থের প্রতি হয়, তাহলে বিচার বিভাগের দায়বদ্ধতা কার কাছে? বিচার বিভাগের তো জনগণের সাথে সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। আসলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ধারণা আপেক্ষিক। এই স্বাধীনতা চূড়ান্ত কোনো বিষয় নয়, রাষ্ট্রকে ছাপিয়েও নয়। বিচার বিভাগ এমনভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবে যেন অন্য দুটি বিভাগ- আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ তাদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে না পারে। বাংলাদেশের আদি সংবিধানে বিচার বিভাগ আলাদা করার কথা বলা হলেও তার বহুদিন বাদে মাজদার হোসেন মামলায় আদালত এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু প্রস্তাবনা রাখে। তাতে করে বিচারকদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আলাদা কিছু পরীক্ষা আর বেতন-কাঠামোর পরিবর্তন ছাড়া এখন পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পূর্বের আলোচনাতেও দেখানো হয়েছে, বাংলাদেশের নিম্ন আদালত প্রায় সবকিছুর জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী। আবার সংবিধান অনুযায়ী উচ্চ আদালতে প্রধান বিচারপতির নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগের অন্যান্য বিচারকগণকে নিয়োগ দেন। (অনুচ্ছেদ ৯৫(১)) আমরা জানি, রাষ্ট্রপতি একজন দলীয় ব্যক্তি। তাহলে একজন দলীয় ব্যক্তি দিয়ে কীভাবে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচারক *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

মানবকল্যাণে সোভিয়েতের দান

(দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার উপর হিটলারি নাৎসী বাহিনীর আক্রমণের পর বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী-বুদ্ধিজীবীরা জনগণের উদ্দেশ্যে এক আবেদনপত্র প্রচার করেন। নীচে তা দেয়া হলো।)

সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নাৎসী আক্রমণ পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। বিশাল রণক্ষেত্র জুড়িয়া আজ যন্ত্র ও মানুষের তাণ্ডব চলিতেছে; ব্যাপকতায় এ যুদ্ধ অভূতপূর্ব। এই সংকটকালে আমরা মনে করি, নৈতিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপুল কীর্তির প্রতি সর্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা একান্ত কর্তব্য। আমরা কেহ কেহ সোভিয়েত শাসনের কোনো কোনো বিষয়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া থাকি; কেহ কেহ মার্কসবাদ সমর্থনও করি না। কিন্তু জার আমলের কুশাসনের যে কুৎসিত উত্তরাধিকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এবং তারপর সদ্যোজাত সোভিয়েতের বিরুদ্ধে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাষ্ট্র যে মারত্মক আক্রমণ চালিয়েছিল তাহা যখন স্মরণ করা যায়, তখন সোভিয়েতের বর্তমান কীর্তিকে মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। রবীন্দ্রনাথ উহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। আধুনিক জগতের দুজন প্রধান সমাজতত্ত্ববিদ সিডনি ও বীটরিস ওয়েব, তাঁদের "সোভিয়েত কমিউনিজম- এক নতুন সভ্যতা" (Soviet Communism,- A New Civilisation) নামক পুস্তক প্রকাশ করার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে প্রচুর নির্ভরযোগ্য তথ্য সকলের গোচরে আসিয়াছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত কারখানা, খনি, রেলওয়ে, জাহাজ, জমি ও ব্যবসা-বাণিজ্য জনসাধারণের সম্পত্তি। দেশের অর্থনৈতিক বা সামাজিক জীবন সকলের মঙ্গলের জন্য পরিকল্পিত – কয়েকজন মানুষের মুনাফার জন্য নয়। যাহারা সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সমর্থক নয়, সোভিয়েত পরিকল্পনা তাহাদিগকেও অনুরক্ত করে। সেখানে শিক্ষার সমান সুযোগ সার্বজনীন; প্রত্যেককে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলে পড়িতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সরকারি ব্যয়ে অধ্যয়ন করেন। সকলের জন্য কাজের ব্যবস্থা আছে; সোভিয়েত ইউনিয়নে কেহ বেকার নাই। অন্য সমস্ত স্থানে বারবার যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়া থাকে, সেখানে তাহারা লুপ্ত হইয়াছে। সর্বাধিক খাটুনির সময় দিনে আট ঘন্টা; গড়ে তাহা দিনে সাত ঘন্টার কম। সকলের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। শ্রমিকরা পীড়িত অবস্থায় পুরা মজুরি পায়; এতদ্ব্যতীত তাহারা প্রতি বৎসর বেতনসহ ছুটি পায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে নারী ও শিশুর যে রূপ যত্ন লওয়া হয় জগতের আর কোথাও সেরূপ লওয়া হয় না। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকগণই এইসব কথা স্বীকার করিয়াছেন। সোভিয়েত পরিকল্পনাগুলি যে কার্য সাধনে প্রয়াসী, কোনো প্রাচীন বা আধুনিক রাষ্ট্র এ পর্যন্ত সে কাজে হাত দেয় নাই; এই পরিকল্পনাগুলি ব্যাপকতায় যেমন বিরাট, তেমনই বাস্তব প্রয়োগোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত।

সিডনি ও বিটরিস ওয়েব বলিয়াছেন, "আমাদের মনে হয়, এমন দেশ নাই যেখানে সমভাবে থিয়োরী ও টেকনিকের ক্ষেত্রে সরকারি অর্থ ব্যয় এতবেশি ও এত বিচিত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতেছে। মুনাফালোভী প্রবৃদ্ধির ফলে বিজ্ঞান যেভাবে ব্যর্থ হইতেছে, সে সম্বন্ধে, ব্রিটিশ ও আমেরিকান বৈজ্ঞানিকেরা এখন অনুযোগ করিতেছেন। এ কথা অন্তত নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এখানে (সোভিয়েত দেশে) সে ব্যর্থতার সুযোগ একরকম নাই।"

জার গভর্নমেন্ট অন্যান্য প্রধান রাষ্ট্রের সহযোগে এশিয়ার দেশসমূহে যেসকল অন্যায় সুবিধা ভোগ করিত, বিপ্লবের পর সোভিয়েত সেসব সুবিধা এক কথায় ছাড়িয়া দেয়, – আমরা ভারতবাসীরা ইহা ভুলিতে পারি না। বহু জাতিকে ও কোটি কোটি লোককে জার শাসন ইচ্ছাপূর্বক 'অনুন্নত' করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সোভিয়েতের জাতিগত ও ভাষাগত স্বাধীনতা প্রত্যেকের উৎকৃষ্ট সংস্কৃতিকে বিকশিত করিয়াছে। যেখানে একদিন কুসংস্কার ও ধর্মতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার রাজত্ব ছিল সেখানে আজ এক নতুন মানস-জীবনের সঞ্চার হইয়াছে। কারণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৮৫টি জাতি ও ১৪৭টি ভাষার মধ্যের কোনো একটা বিশেষ জাতি বা ভাষার কৃত্রিম প্রাধান্য নাই। মুসলমান রাষ্ট্রের মধ্যে নারীমুক্তির প্রথম আইন প্রবর্তিত হয় সোভিয়েত 'আজেরবাইজানে', কামালের তুরস্কে নয়। বুখারা রাজ্যের সহিত আধুনিক সোভিয়েত 'উজবেকিস্তানের' পার্থক্য ছিল বিপুল। বুখারায় ছিল আট হাজার ওঝা ও আমীর, তাহার হারেম ও তাহার দরবারের জন্য মাত্র একজন ডাক্তার। ওয়েব দম্পতি লিখিয়াছেন, "সোভিয়েত ইউনিয়ন অনগ্রসর জাতিগুলিকে শুধু যে সমান অধিকার দিয়াছে তাহা নহে। পরন্তু তাহাদের অনুন্নত অবস্থার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী দারিদ্র্য, অত্যাচার ও দাসত্ব দায়ী ইহা স্বীকার করিয়া তাহাদের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতি, শ্রমশিল্পের উন্নতি ও কৃষি সংস্কার বাবদ উন্নত জাতিগুলি অপেক্ষা মাথা পিছু ব্যয় সরকারি তহবিল হইতে বরাদ্দ করিয়াছে।"

সোভিয়েত ইউনিয়নে পুস্তক প্রকাশের সংখ্যাও বিপুল। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা একত্রে ইংল্যান্ড, জার্মানি ও জাপান অপেক্ষা বেশি ছিল। নাৎসী নির্বাসিত আইনস্টাইনের পুস্তক সম্ভবত অন্য যেকোনো দেশ অপেক্ষা সোভিয়েত ইউনিয়নে বেশি বিক্রয় হয়; ১৯২৭ ও ১৯৩৬ সালের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থ ৫৫,০০০ খণ্ড সেখানে বিক্রয় হয়। শেক্সপীয়ারের ৩৭৫তম জন্মাবার্ষিকী তাঁহার স্বদেশে অলক্ষিত থাকলেও, সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বত্র শ্রমিক ও কৃষকগণ তাঁহার জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত করে। ১৯৩৯ সালের বসন্তকালে মস্কোতে প্রায় ২ লক্ষ লোক 'কিং লীয়ার' অভিনয় দেখে। ক্ষুদ্র আর্মেনিয়া রাষ্ট্রে গত পাঁচ বৎসরের শেক্সপীয়ারের গ্রন্থ ৩২,০০০ খণ্ড বিক্রয় হয়।

আমরা যে অর্থে বুঝি সে অর্থে সোভিয়েতের জনসাধারণের মধ্যে কোনো সংস্কৃতিবান শ্রেণি নাই; এবং তাহারা ইহা চাহেও না। তাহারা চাহে সমস্ত জাতিকে সংস্কৃতিবান করতে। তাহারা সকলকে অবকাশ, নির্বিঘ্নতা ও সুযোগ দিতে চায়।

কুড়ি বৎসরের প্রবল বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণ এক নতুন সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। সে সভ্যতা যখন বিপদাপন্ন , তখন আমরা বহু যুগব্যাপী অন্নাভাবে জীর্ণ, হীনতায় নিমজ্জিত ভারতবাসীরা নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারি না। আমরা অসহায় ও পরাধীন; তথাপি সোভিয়েতে অন্তত আমাদের শুভ কামনা আমরা প্রেরণ করিতে পারি। সোভিয়েত ইউনিয়ন সেদিন তাহার বিরুদ্ধে শক্তিপুঞ্জকে পরাভূত করিয়া আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে, সেই দিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করিয়া থাকিব।

স্বাক্ষর

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, যামিনী রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, হিরণকুমার সান্ন্যাল, নীরেন্দ্র রায়, গোপাল হালদার, আবু সৈয়দ আয়ুব, আব্দুল কাদের, সমর সেন, বিনয় ঘোষ, অজিত চক্রবর্তী, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য প্রমুখ।

এই গণহত্যা বন্ধ কর

(১ম পৃষ্ঠার পর) ". . .মানুষ কেন শরণার্থী হয়, বাংলাদেশের মানুষ সেটা জানে। একাত্তরের কথা তাদের পক্ষে কোনোদিনই এবং কোনোভাবেই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। লাখ লাখ বাঙালি যে সেদিন শরণার্থী হয়েছিল, তা কাজের খোঁজে বা সুবিধার লোভে নয়, প্রাণের ভয়ে। রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রেও ঠিক সেটাই ঘটেছে। গণহত্যার মুখোমুখি হয়ে তারা বিষয়-সম্পত্তি, ঘরবাড়ি, সহায়-সম্বল, এমনকি আপনজনকেও ফেলে রেখে প্রাণ বাঁচাতেই পালিয়ে আসছে। তারা মারা পড়ছে, হারিয়ে যাচ্ছে, দগ্ধ হচ্ছে। মৃতের লাশ, আহত মানুষ, বিপন্ন শিশু ও বৃদ্ধকে মাথায় করে, কোলে করে নিয়ে তারা ছুটছে আশ্রয়ের সন্ধানে, নৌকা ডুবে যাওয়ায় অনেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। তাদের আশ্রয় না দিলে তারা যাবে কোথায়? আমরা আজ যদি বিপন্ন রোহিঙ্গাদের আশ্রয় না দিই, তাহলে কেবল নিজেদের ইতিহাস থেকেই নয়, অন্তর্গত মনুষ্যত্ব থেকেও বিচ্যুত হব।"

এখন কথা আসতে পারে রোহিঙ্গারা দেশে যে অবৈধ কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয় – তার জবাব কী? এদের তো মাদক চোরাকারবারি কিংবা সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো ব্যবহার করবে। ঠিক, তাদের ব্যবহার করা হয়। এই লোকেরা রোহিঙ্গাদের না পেলেও অন্য কাউকে না কাউকে ব্যবহার করে তাদের কাজ করে। রোহিঙ্গারা এখানে এসে কোনোরকম কাজকর্মবিহীন অবস্থায় অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটায় বলে টাকার বিনিময়ে অনেক কিছুই তারা করতে বাধ্য হয়। সেটা রোহিঙ্গা আসার সমস্যা নয়। এই সমস্যা থেকে উদ্ধার পেতে হলে যারা এ কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

সেক্ষেত্রে যত রোহিঙ্গা আসে তাদের শরণার্থী হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে, শরণার্থী কার্ড দিয়ে, শরণার্থী শিবিরে পুনর্বাসন করা উচিত। তাহলে তাদের সংখ্যা ও তাদের পরিচয় সম্পর্কিত নির্দিষ্ট তথ্য সরকারের হাতে থাকবে। সেই শরণার্থী শিবির পরিচালনা করার জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য চাইতে পারে সরকার। একই সাথে মিয়ানমার সরকারের উপর কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা দরকার যাতে তারা রোহিঙ্গাদের উপর এই অমানবিক অত্যাচার বন্ধ করে ও পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের ফেরত নেয়। তাদের এই অত্যাচারের কথা বিশ্ববাসীকে জানানোর ব্যবস্থা নেয়া উচিত। সারা বিশ্ব যাতে মিয়ানমার সরকারের এই ঘৃণ্য আচরণের বিরুদ্ধে সরব হয় সে পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য মিয়ানমার সরকারকে বাধ্য করা উচিত। রোহিঙ্গাদের সব রকম নাগরিক অধিকার দিয়ে তাদের নিজস্ব জায়গায় পুনর্বাসিত করার ব্যাপারে কিছু দলিল বাংলাদেশ সরকার ব্যবহার করতে পারে। আন্তর্জাতিকভাবে এ নিয়ে আলোচনা তুলতে পারে। তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য প্রকৌশলী কল্লোল মোস্তফা এ ব্যাপারে কিছু দলিলের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, " . . . ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ও তৎকালীন বার্মা সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'রিপ্যাট্রিয়েশান এগ্রিমেন্ট' বা 'প্রত্যাবাসন চুক্তি'তে সেসময় বার্মা থেকে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরকে বার্মার বৈধ নাগরিক হিসেবে পরিষ্কার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল এবং এই চুক্তির আওতায় তাদের ফিরিয়ে নেয়া হয়েছিল। তাছাড়া ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সরকারের যৌথ ঘোষণাতেও একইভাবে সেসময় বাংলাদেশে আসা শরণার্থীদেরকে মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেয়ার অঙ্গীকার করা হয়। এগুলো ঐতিহাসিক দলিল, ১৯৭৮ সালের চুক্তিটি পাওয়া যাচ্ছে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে, ২০১৪ সালে গবেষণার জন্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিকে সরবরাহ করা হয়েছিল। আর ১৯৯২ সালের যৌথ ঘোষণাটি পাওয়া যাচ্ছে *forcedmigration.org* এর ওয়েবসাইটে। এগুলো নিশ্চয় বাংলাদেশ সরকারের কাছেও আছে, তাহলে আজকে বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে এই দলিলগুলো ব্যবহার করে মিয়ানমার সরকার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব অস্বীকারের বিরোধিতা ও রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে আন্তর্জাতিক তৎপরতা চালাতে অসুবিধা কোথায়?"

সরকারের অসুবিধা কোথায় আমরা জানি। রাষ্ট্রটা যেহেতু পুঁজিবাদী, সে একটা শ্রেণিগত লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতেই এ ব্যাপারগুলো দেখে, মানবিক দিক থেকে নয়। একটি নিপীড়িত জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দেবার মানবিক দায় আজ কোনো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই অনুভব করে না, একটা সময় সমাজতান্ত্রিক শিবির যখন বিশ্বে ছিলো তখন সে এই দায়িত্ব পালন করতো। এই রাষ্ট্রগুলো যতটুকুও বা করে তা জনগণের চাপে পড়ে করে। সিরিয়ার সংকটেও আমরা দেখেছি রাষ্ট্র বাধা দিলেও ইউরোপের দেশে দেশে সাধারণ মানুষ শরণার্থীদের স্বাগত জানিয়েছে।

রোহিঙ্গাদের ব্যাপারেও এদেশের মানুষকে দাঁড়াতে হবে। তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের দলের পক্ষ থেকে শরণার্থীরা অবস্থান করেন এমন এলাকাগুলো পরিদর্শন করেছি। সেখানে উপবাসী লোকেরা বসে আছেন আশ্রয়ের আশায়। তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করার জন্য দলের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই মানুষের কাছে আহবান জানানো হয়েছে।

২৪ আগস্ট : নারী নির্যাতনবিরোধী লড়াইয়ের চেতনা আজও অম্লান

২৪ আগস্ট নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস। দিবসটিকে স্মরণ করে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও নোয়াখালীসহ দেশব্যাপী মিছিল-সমাবেশ-আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিচারব্যবস্থার প্রতি আওয়ামী সরকারের ফ্যাসিবাদী মনোভাব উন্মোচিত হয়েছে

গত ২২ আগষ্ট সকালে তোপখানা রোডে নির্মল সেন মিলনায়তনে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, এটা অত্যন্ত পরিস্কার যে, অতীতের সরকারগুলোর ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারও অপরাপর সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মত বিচার বিভাগকেও *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্যকে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে

–সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

'অক্টোবর বিপ্লব শতবর্ষ উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি'র উদ্যোগে গত ২৫ আগস্ট, বিকাল ৪টায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি গেমস্‌রুমে শিক্ষক-লেখক-বুদ্ধিজীবী-বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আহমদ রফিকের সভাপতিত্বে এবং সমন্বয়ক হায়দার আকবর খান রনোর সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। আরও আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. অজয় রায়, সৈয়দ আবুল মকসুদ, ডা. আনোয়ারা সৈয়দ হক, ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, অধ্যাপক সফিউদ্দিন আহমদ প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, শ্রেণি-পেশা ও সংস্কৃতি কর্মীদের সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে গঠন করা হয়েছে 'অক্টোবর বিপ্লব শতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি'। এই কমিটি কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় আগামী ১ অক্টোবর শতবর্ষের কর্মসূচি শুরু হবে, ৭ নভেম্বর মহাসমাবেশ ও লালপতাকা মিছিলের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হবে। এই সময়ের মধ্যে দেশের প্রগতিশীল শ্রমিক-কৃষক-ক্ষেতমজুর-ছাত্র-যুব-নারী-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো ঢাকায় সভা-সমাবেশ-প্রদর্শনী-সেমিনার-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানামাত্রিক কর্মসূচি পালন করবে। এছাড়া দেশের প্রতিটি জেলায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সমন্বয়ে অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কেবল অনুষ্ঠানসর্বস্বতা নয়, বরং এই মহান বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সকল মানুষের কাছে তুলে ধরে এদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যেই এই জাতীয় কমিটি কর্মসূচি পালন করবে।'

হাওর অঞ্চলকে দুর্গত এলাকা ঘোষণাসহ ১২ দফা দাবিতে অনুষ্ঠিত হলো আঞ্চলিক হাওর কনভেনশন

কয়েক মাস আগে পাহাড়ি ঢল থেকে সৃষ্ট বন্যায় ভেসে যায় সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলের ফসল। হাজার হাজার কৃষক সর্বস্বান্ত হয়। লাখো মানুষ নিরুপায় ও অসহায় হয়ে এখন আস্তে আস্তে শহরের দিকে রওনা হচ্ছে কাজের আশায়। বাসদ (মার্কসবাদী) কৃষকদের এ সমস্যা সমাধানের জন্য ১২ দফা দাবি নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচার চালায় এবং প্রায় আট হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে গত ১৭ জুলাই জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করে।

এরপর গত ২৫ আগস্ট সুনামগঞ্জ শহরের আবুল হোসেন মিলনায়তনে আড়াই শতাধিক কৃষকের উপস্থিতিতে বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট অঞ্চলের উদ্যোগে আঞ্চলিক হাওর কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন বাসদ (মার্কসবাদী)'র সিলেট জেলা শাখার আহ্বায়ক কমরেড উজ্জ্বল রায় ও পরিচালনা করেন দলের সুনামগঞ্জ জেলার সংগঠক আল আমিন। বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, 'জল ও পরিবেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট'র চেয়ারম্যান ম. ইনামুল হক, বিশিষ্ট নারীনেত্রী ও 'উদীচী' সুনামগঞ্জ জেলার সভাপতি শীলা রায়, 'হাওর বাঁচাও সুনামগঞ্জ বাঁচাও আন্দোলন' এর আহবায়ক এড.ভোকেট বজলুল মজিদ চৌধুরী খসরু, সিপিবি সুনামগঞ্জ জেলার সভাপতি চিত্তরঞ্জন তালুকদার, 'জাসদ' সুনামগঞ্জ জেলার সভাপতি আ.ত.ম. সালেহ্, লেখক ও গবেষক সুখেন্দু সেন, 'বাংলাদেশ আইনজীবী সমিতি সুনামগঞ্জ জেলার সভাপতি এড. রুহুল তুহিন, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ফতেহপুর ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুহিবুর রহমান, 'দৈনিক কালের কণ্ঠ' পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি শামস্ শামিম, 'দৈনিক সুনামগঞ্জ খবর' এর সম্পাদক পংকজ কান্তি দে, বাসদ (মার্কবাদী) হবিগঞ্জ জেলার সংগঠক শফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজের সভাপতি দিপাল ভট্টাচার্য, দিরাইয়ের জেলে প্রতিনিধি আব্দুল হাই, ধর্মপাশার কৃষক প্রতিনিধি লিয়াকত আলী ও জেলে প্রতিনিধি রফিকুল এবং ছাত্র প্রতিনিধি ইমরান। কনভেনশনের শুরুতে 'কনভেনশন পেপার' পাঠ করেন আল আমিন। কনভেনশনে ধর্মপাশা, দিরাই, বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর উপজেলা ও সিলেট জেলা মিছিল সহকারে উপস্থিত হয়। কনভেনশনে ২য় অধিবেশনের শুরুতে বাউল শাহ আব্দুল করিমের গান পরিবেশন করেন বাউল কারিবউল্লাহ্।

কনভেনশনে ১২ দফা দাবি নিয়ে আরও ব্যাপকভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করা হয়।

বন্যার্তদের জন্য ছাত্র ফ্রন্টের 'স্যালাইন প্রজেক্ট'

সারাদেশে ভয়াবহ বন্যার কারণে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের বিনামূল্যে খাবার স্যালাইন বানানোর উদ্যোগ নিয়েছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। গত ২৭ আগস্ট বিকাল ৪টায় ডাকসু-তে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. আকমল হোসেন। আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. জোবাইদা নাসরীন, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মোশাহিদা সুলতানা।

উদ্বোধনী বক্তব্যে ড. আকমল হোসেন বলেন, 'সারাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সে সময় সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ত্রাণ তৎপরতা এবং ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য স্যালাইন প্রজেক্ট খুবই প্রশংসনীয় উদোগ। এ ধরনের উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রীদের এগিয়ে আসা খুবই প্রয়োজন। কারণ প্রাকৃতির দুর্যোগ ও সামাজিক সংকট মোকাবেলায় শিক্ষার্থীরা এগিয়ে এলে সংকটগ্রস্ত অসহায় মানুষেরা ভরসা পায় এবং সামাজিক মূল্যবোধের বিস্তার ঘটে।'

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের পক্ষ থেকে সকল দুর্গত অঞ্চলে মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় ঔষুধ সরবরাহের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি বন্যার্তদের সহযোগিতার জন্য স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে স্যালাইন প্রজেক্ট ও চলমান ত্রাণ তৎপরতায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

এর আগে গত ২৩ আগস্ট সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আগামী দুই মাস দেশব্যাপী শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এই সময় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্যাক্রান্ত শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাউপকরণ – বই, খাতা, কলম, পেন্সিল সংগ্রহ করা হবে। পাশাপাশি বন্যাদুর্গত শিক্ষার্থীদের এক বছরের বেতন-ফি মওকুফ, বিনামূল্যে শিক্ষাউপকরণ সরবরাহ, চার হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনর্নির্মাণ-সংস্কারের দাবিতে কেন্দ্রীয়ভাবে এবং দেশব্যাপী গত ২৮ আগস্ট শিক্ষামন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট নওগাঁ জেলা কমিটি গঠিত

গত ২৪ আগস্ট '১৭ সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ৫ম কাউন্সিল এবং কমিটি পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কাউন্সিলে আলোচনা করেন বাসদ (মার্কসবাদী) নওগাঁ জেলার সংগঠক অধাপক মু আ ব সিদ্দিকী বাদাম, জহির রায়হান চলচ্চিত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক রহমান রায়হান, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের নওগাঁ জেলার সাবেক সভাপতি মতিউর রহমান মিঠু।

কাঞ্চন সরকারকে আহ্বায়ক ও আবু সাঈদ হাবীবকে সাধারণ সম্পাদক করে ৬ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি পরিচয় করিয়ে দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টু।

ভয়াবহ বন্যা অথচ সরকার নির্বিকার!

বরিশালে ত্রাণ সংগ্রহ

(১ম পৃষ্ঠার পর) এর প্রতিক্রিয়া এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকবেনা।

আবার বন্যার পানি নামার সময় নানা রকম পানিবাহিত রোগ মহামারি আকারে দেখা দেবে, অথচ এই অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য কোনো উদ্যোগ-আয়োজন সরকারের পক্ষ থেকে নেই। ভেঙে পড়া স্কুলঘর, রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণে কোনো ত্বরিত পদক্ষেপ সরকারের পক্ষ থেকে লক্ষ করা যাচ্ছে না। একেবারেই মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে বন্যায় আক্রান্ত মানুষেরা।

দেশে যখন এমন এক পরিস্থিতি তখন দেশের সরকার ব্যস্ত সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী নিয়ে। ব্যস্ত প্রধান বিচারপতির বক্তব্যের পাল্টা বক্তব্য তৈরিতে। কীভাবে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমে আসবে, কীভাবে সমস্ত দুর্গত মানুষদের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেয়া যাবে, বন্যা পরবর্তী মহামারি কীভাবে মোকাবেলা করা যাবে, মানবিক সংকটটা কীভাবে আটকানো যায় – এসব নিয়ে সরকারের কোনো ব্যস্ততা লক্ষ করা যায়নি। পত্রপত্রিকায় আমরা বন্যার সময়ে দেখেছি, ঐ এলাকার মানুষের কী দুর্ভোগ! ত্রাণ না পাওয়ায় তাদের কান্না আমরা গণমাধ্যমগুলোতে দেখেছি। বন্যা আক্রান্ত ৭০ লক্ষ মানুষের মধ্যে মাত্র ২৫ লক্ষ সরকারি ত্রাণের আওতায় এসেছে। তাহলে বাকি ৪৫ লক্ষ মানুষ কীভাবে বাঁচবে, তা নিয়ে সরকারের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আমরা এও দেখেছি, প্রধানমন্ত্রী যখন উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গেলেন, সেখানে ত্রাণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবার ঘোষণা দিলেন। কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটেনি। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য যত ফলাও করে গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে, তার সামান্য পরিমাণ কার্যকারিতাও দুর্গত জনগণ উপলব্ধি করেনি। বরং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী-এমপিদের মুখে শোনা গেছে – 'দেশে কোনো বন্যা নেই।' বাস্তবিকপক্ষে সরকারিভাবে বরাদ্দ ছিল নিতান্ত স্বল্প এবং যতটুকু বরাদ্দ ছিল তার বেশিরভাগই স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের পকেটে গেছে। ঠিক একই রকম লুটপাট আমরা দেখেছি বন্যাকবলিত হাওর অঞ্চল নিয়েও।

পর্যাপ্ত ত্রাণের দাবিতে গাইবান্ধায় বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি পেশ

মানুষের এমন অবর্ণনীয় কষ্টের পরও সরকার এত নির্লিপ্ত কেন? কারণ শত শত মানুষের কান্নার শব্দ, বাঁচার আকুতি সরকারের কানে পৌঁছায় না। ইতিপূর্বে শুকনো মৌসুমে আমরা দেখেছি, বাংলাদেশ ভারতের যেসকল আন্তর্জাতিক নদী রয়েছে সেগুলোতে বাঁধ দিয়ে ভারত সরকার কীভাবে পানি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। আর এখন বর্ষাকালে যখন গঙ্গা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্রে ধারণ ক্ষমতার বেশি পরিমাণ পানি প্রবাহিত হচ্ছে তখন ভারত সরকার সমস্ত বাঁধ খুলে দিয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশের বন্যা পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। কোনো সরকারই সাম্রাজ্যবাদী ভারতের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়ে দাঁড়ায়নি, নিজেদের ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে যায়নি।

আমরা জানি, বন্যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও, মনুষ্যসৃষ্ট অনেক কারণই বন্যাকে প্রভাবিত করে। বন্যা তখনই হয় যখন দেশের নদীগুলোর পানি ধারণ ক্ষমতার থেকে নদীগুলোতে প্রবাহিত পানির পরিমাণ বেশি হয়ে যায়। উজানে বৃষ্টির পরিমাণ যদি বেশি হয় অতিরিক্ত পানি যদি প্রায় প্রতিনিয়ত নদীগুলো দিয়ে নামে তাহলে সরকারের উচিৎ নদীগুলো খনন করা। আমরা দেখি বিভিন্ন নদীতে সেতু হয়, যোগাযোগব্যবস্থা গতিশীল রাখতে সেতু প্রয়োজনীয় কিন্তু সেতু নদীর স্বাভাবিক স্রোতধারায় বাধা সৃষ্টি করে। যার ফলে সেতুর নীচে চর পরতে দেখা যায়। দেশের প্রায় সমস্ত বড় বড় নদীতেই এভাবে সৃষ্টি হচ্ছে পলির পাহাড়। কিন্তু কোথাও কোনো নদী খননের উদ্যোগ নেই, কদাচিৎ কোনো নদীতে যদি খনন কাজ চলেও সেই খননকৃত পলি ফেলে রাখা হয় নদীর পাড়ে, যা পুনরায় নদীতেই ফিরে আসে। এভাবেই বাজে উন্নয়নের ভাঙ্গা ঢোল আর নদীখেকো ব্যবসায়ীরা নদী ভরাট করে গড়ে তুলে শিল্প কারখানা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের অধিকাংশ ছোট ও মাঝারি নদীর মৃত্যু হয়েছে নদী শাসনের ফলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব নদী শাসিত হয়েছে ব্যক্তি উদ্যোগে। নদী বিশেষজ্ঞদের ভাষায় উজান থেকে নেমে আসা পলির কারণে পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্রের মতো বড় ও প্রধান নদীগুলোর তলদেশ প্রতি তিন বছরে এক ফুট করে ভরাট হচ্ছে। তাদের আশঙ্কা খনন না করা হলে ২৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের প্রধান প্রবাহমান নদীগুলো প্রায় স্রোতহীন মৃত খালে পরিণত হবে। কাজেই এভাবে চলতে থাকলে পাহাড়ে সামান্যবৃষ্টি হলেই বাংলাদেশে বন্যা দেখা দেবে তা প্রায় নিশ্চিত। বাস্তবিকপক্ষে বাংলাদেশের পালাক্রমে ক্ষমতায় আসা দলগুলো কী এ বিষয়টা জানেন না?

স্কুল শিক্ষার্থীরাও পিছিয়ে ছিল না

যখনই কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার প্রশ্ন আসে, তখনই সরকার বিভিন্ন অজুহাত দাঁড় করায়। সরকার বলে দুর্যোগ পূর্বাভাসের পর্যাপ্ত প্রযুক্তি তাদের কাছে নেই, তাই তারা ঠিকঠাক পূর্বাভাস দিতে পারে না। স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরেও দুর্যোগ পূর্বাভাসের উন্নত প্রযুক্তি থাকে না, অথচ এই ৪৬ বছরেই কত যুদ্ধ বিমান বিনা প্রয়োজনেই কেনা হয়েছে।

গত জুলাই থেকে আগস্ট থেকে যে বন্যা শুরু হলো, সরকারকে বিভিন্ন বিদেশি সংস্থা এই ভবিতব্য বন্যার পূর্বাভাস দিয়েছিল গত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসেই। কিন্তু এই ৫-৬ মাসেও সরকার পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে পারেনি, পর্যাপ্ত খাবারের মজুদ রাখেনি। গবাদিপশুগুলোকে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করেনি।

সদ্যজাত শিশু ও গর্ভবতী নারীদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ৫-৬ মাস সময়েও সরকার করতে পারেনি। বন্যা চলাকালীন সময়েও আমরা দেখেছি সরকারের উদাসীনতা। সারা উত্তরবঙ্গ যখন বন্যায় ভাসছে, যখন ঘর-বাড়ি ডুবে গেছে, সমস্ত সহায় সম্বল হারিয়ে অনাহারে পেটের ক্ষুধায় হাহাকার করছে সমস্ত উত্তরবঙ্গের মানুষ, তখনো সরকার বুঝতে পারেনি বন্যা হয়েছে কী হয়নি! এই হচ্ছে সরকারের অবস্থা।

বগুড়ায় বাসদ (মার্কসবাদী)'র উদ্যোগে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

এই পরিস্থিতিতে আমাদের দাবি হলো-বন্যায় আক্রান্ত এলাকার কৃষকদের সকল প্রকার কৃষিঋণ মওকুফ করতে হবে। এনজিও'র ঋণ মওকুফ করতে হবে। তারা যাতে সর্বস্বান্ত হওয়া এই কৃষকদের উপর কোনো চাপ প্রয়োগ না করতে পারে তার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। কৃষকদের বিনামূল্যে বীজ সরবরাহ করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করতে হবে। ছাত্রদের বেতন ও অন্যান্য ফি আগামী এক বছরের জন্য মওকুফ করে দিতে হবে। বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করতে হবে। বন্যাকবলিত এলাকায় উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। একেবারে ভেতরের এলাকাগুলোতেও মেডিকেল টিম পাঠাতে হবে। বন্যা পরবর্তী মহামারি প্রতিরোধ করতে হবে।

এই একবিংশ শতাব্দীতে, যখন বড় বড় বাঁধ দিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের থেকেও নিচু এলাকাগুলোতে পরিকল্পিত শহর গড়ে তোলা হচ্ছে, সেসময়ে এদেশের মানুষের বারবার ভাগ্যের উপর নিজেদের সমর্পন করার মতো ব্যর্থতা আর কিছুই হতে পারে না।

রক্তে লেখা ফুলবাড়ি বিদ্রোহের ইতিহাস ভোলা যায় না

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কয়লা তোলা বন্ধসহ ছয় দফা দাবি মেনে নেবার প্রতিশ্রুতি দিল। তখন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ছিল বিরোধী দলের ভূমিকায়। তারাও বলল, ক্ষমতায় গেলে ছয় দফা বাস্তবায়ন করবে। ২৬ আগস্ট ফুলবাড়ীতে ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানে রচিত হলো সংগ্রামের এক বীরত্বগাথা। এই আন্দোলনের পুরোভাগে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছিল তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি।

এবছর ফুলবাড়ী দিবস ১১ বছরে পদার্পন করল। এই ১১ বছরে ক্ষমতার পট পরিবর্তন ঘটেছে। শাসকদের চেহারা পাল্টেছে। কিন্তু ফুলবাড়ীর জনগণের সাথে প্রতারণার ব্যাপারটি অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। বিএনপি প্রতি-শ্রুতি রক্ষা করেনি। আওয়ামী লীগও দুই দফা ক্ষমতায় এসে একই কাজ করেছে। আজও এশিয়া এনার্জিকে বহিষ্কার করা হয়নি, আজও ওখানকার জনগণের হয়রানি বন্ধ হয়নি, মিথ্যা মামলা তুলে নেয়া হয়নি, এমনকি হত্যাকাণ্ডের সাথে যারা যুক্ত তাদেরও বিচার হয়নি। বরং বিভিন্ন সময়ে নানা কৌশলে ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা তোলার কথা শোনা গেছে। তবে এখনও ওই অঞ্চলের মানুষের সজাগ-সচেতন অবস্থা আছে বলেই শাসকেরা পেরে উঠেনি। কিন্তু ষড়যন্ত্র থেমে নেই। ফুলবাড়ী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কী হবে তা হয়তো বলা মুশকিল, কিন্তু এই বীরোচিত লড়াই ওই অঞ্চলের মানুষের হৃদয়ে কী যে গভীর ছাপ ফেলেছে, তা সহজেই বোঝা যায়। সেই সময়ের একজন আন্দোলনকারী গোলবানুর একটি উক্তিতে ধরা পড়ে হার না মানা তেজ। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "আমরা বাঁচি থাকতে এই চুক্তি পারবি না করতে। কি মনে করছে আমরা মরি যাব? আমরা যদি একটা মানুষ মরি যাই আমাদের ছাওয়াল পাওয়াল তিনটা বড় হবে। মায়ের ইতিহাস ধরে কি থাকবে না?" গোলবানুদের মতো মায়েরা আমাদের চারপাশে আছে বলে তরিকুল-সালেকীনদের জন্ম হয়েছিল। হয়তো আরও বহু তাজা প্রাণ প্রস্তুত হচ্ছে। রক্তের দাগ এত সহজে মোছা যায় না, যাবে না।

সরকারের কর্তৃত্বকারী ভূমিকার নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে

(২য় পৃষ্ঠার পর) নিয়োগ হবে? তার মানে বিচারক নিয়োগেও পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। তাই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া যেমন প্রশ্নবিদ্ধ তেমনি বিচারক অপসারণে দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যদের সমর্থনও ত্রুটিপূর্ণ।

কেমন হবে রাষ্ট্রের তিনটি স্তম্ভের সম্পর্ক?

ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়ে এত যখন শোরগোল, তখন একটি কথা না এসে পারে না। আর তা হলো, কেমন হবে রাষ্ট্রের তিনটি স্তম্ভ – আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ আর বিচার বিভাগের মধ্যকার সম্পর্ক। ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মঁতাস্কু ক্ষমতাবিভাজন তত্ত্বের উদ্ভাবক। তিনি তাঁর বিখ্যাত 'স্পিরিট অব ল' বইতে দেখালেন, প্রশাসন, আইন ও বিচার – এই তিনটি বিভাগ প্রত্যেকেই পারস্পরিক হস্তক্ষেপমুক্ত হয়ে যদি স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়, তবেই রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকতে পারে। বলা বাহুল্য মঁতাস্কু যখন ক্ষমতা বিভাজনের এই তত্ত্বটি নিয়ে আসলেন তখন তা সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠেছিল। কেননা সেই সময় অর্থনীতিতে ছিল অবাধ প্রতিযোগিতার যুগ। অর্থনীতিতে একচেটিয়া পুঁজি আসার আগে বুর্জোয়ারা অবাধ প্রতিযোগিতার উপরিকাঠামো হিসেবে সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারণা এনেছিল। এই ধারণা গড়ে উঠেছিল সামন্ত স্বৈরতন্ত্র বা গীর্জার শাসনকে মোকাবেলা করতে গিয়ে। সামন্ত ব্যবস্থায় শাসন, আইন ও বিচারের ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকত। এমন "এক ব্যক্তির শাসন" ছিল পুঁজিবাদ বিকাশের পথে বাধা। সে কারণে পুঁজিবাদ আসার পর সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারণা যখন এল তখন বলা হলো 'সংসদ' হবে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। কিন্তু বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থা একদিকে যেমন অর্থনীতিতে অবাধ প্রতিযোগিতার অবস্থাকে রক্ষা করতে পারেনি তেমনি রাজনৈতিকভাবেও প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের ধারণাও টেকেনি। অর্থনীতির একচেটিয়াকরণ রাজনীতির মঞ্চেও ফ্যাসিবাদী শাসন কাঠামো কায়েম করেছে। এই ফ্যাসিবাদ কখনো এসেছে সামরিক লেবাসে, কখনো এসেছে দুই পার্টির সংসদীয় রাজনীতির খোলসে, কখনো বা মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তির রূপ ধরে। ফলে বুর্জোয়া পার্লামেন্টের মধ্যেই গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়েছে। জনতার প্রতিভূ সংসদ পরিণত হয়েছে ঠুঁটো জগন্নাথে।

বলার অপেক্ষা রাখেনা, 'দেশের সর্বোচ্চ আইন' সংবিধানও তার মর্যাদা ধরে রাখতে পারেনি। শাসক দলের যেকোনো অংশ, যারা যখন ক্ষমতায় এসেছে, তারা প্রত্যেকেই ক্ষমতার প্রয়োজনে সংবিধানের কাটাছেড়া করেছে। আমাদের দেশেও এ পর্যন্ত ১৬ বার সংবিধান পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তন হতেই পারে। সংবিধান কোনো ধর্মগ্রন্থ নয় যে তা পাল্টাতে পারে না। সময় পাল্টে গেলে, আশা-আকাঙ্ক্ষারও বদল ঘটে। কিন্তু দেখা যাবে, পরিবর্তনগুলো জনগণের প্রয়োজন থেকে না হয়ে শাসকদের প্রয়োজনে হয়। আসলে প্রতিবার এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য থাকে সংবিধানের কাঠামোর বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে ক্ষমতার বিভাজন আছে তারই পরিবর্তন করে শোষণমূলক ব্যবস্থাটিকে অক্ষুণ্ন রাখা। এর মাধ্যমে যেমন সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা লোটা যায়, তেমনি সকল প্রকার অন্যায়, অযৌক্তিকতা, জবরদস্তিকে আইনসঙ্গতও করা যায়। তাই দেখা যায়, কতকগুলো ভালো ভালো কথা যুক্ত করে সংবিধান সংশোধন করা হলেও আদতে জনগণের তাতে কোনো ফায়দা হয় না। ফলে ক্ষমতা বিভাজনের যে তত্ত্ব একদিন বুর্জোয়া ব্যবস্থা এনেছিল তারও কোনো কার্যকারিতা থাকে না। পরস্পরের মধ্যে আপেক্ষিক স্বাধীনতার সম্পর্কও রক্ষিত হয় না। ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ রাখার প্রয়োজনে যখন যে বিভাগকে সামনে আনা প্রয়োজন তাকেই বুর্জোয়ারা সামনে আনে।

এ কথাটিও মনে রাখা প্রয়োজন, রাষ্ট্রের যে তিনটি অঙ্গ সেগুলো মূলত শাসকশ্রেণির স্বার্থকে রক্ষা করার জন্যই তৈরি হয়। কিন্তু যখনই এদের একটির সাথে অন্যটির দ্বন্দ্ব তৈরি হয় তখন শাসন ব্যবস্থাকে সংকটমুক্ত রাখার জন্যই তারা নিজেরা নিজেদের সাথে আপোষ করে। আমাদের দেশেও তেমনটি ঘটেছে। যেমন – ২০১৩ সালে শাসনব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখার জন্য আদালতকে দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করা হয়েছে। একইভাবে বাসাবাড়িতে জ্বালানি গ্যাসের মূল্য কমাতে আদালতের রায়কে কাজে লাগানো হয়েছে। আবার সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগ, বদলি, বেতন ইত্যাদির ক্ষমতা রাখা হয়েছে আইন বিভাগের হাতে। এদের মধ্যে কখনো দ্বন্দ্বও তৈরি হয়। আদালতের রায় যতক্ষণ সরকারের কাজে লাগে ততক্ষণ 'সংবিধান মহান' এমন বুলি আওড়ায়। কিন্তু যখনই আদালত কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে, সরকারের কর্মকাণ্ডে বাধা তৈরি করে, বা বাধা তৈরির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তৈরি করে তখনই এক ধরনের বিরোধ তৈরি হয়। ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে, সরকারের সাথে প্রধান বিচারপতির দ্বন্দ্ব। আদতে এটি আইন বিভাগের সাথে বিচার বিভাগের দ্বন্দ্ব। আবার এই দ্বন্দ্ব এই শোষণমূলক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে বেশিদিন স্থায়ীত্বও পাবে না। তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতায় পৌঁছে যাবে।

তবুও বিচার বিভাগের আপেক্ষিক স্বাধীনতার প্রয়োজন আছে

একদিন বুর্জোয়া শ্রেণিই 'আইনের চোখে সবাই সমান', 'আইনের শাসন' ইত্যাদি কথা সামনে এনেছিল। ক্ষমতা কাঠামোতে স্বেচ্ছাচার আটকাতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজনের মাধ্যমে ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে চেয়েছিল। তারা বুঝেছিল যদি বিচারবিভাগকে অন্য সকল কিছু থেকে আলাদা করে আপেক্ষিকভাবে

এই ফ্যাসিবাদ কখনো এসেছে সামরিক লেবাসে, কখনো এসেছে দুই পার্টির সংসদীয় রাজনীতির খোলসে, কখনো বা মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তির রূপ ধরে। ফলে বুর্জোয়া পার্লামেন্টের মধ্যেই গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়েছে। জনতার প্রতিভূ সংসদ পরিণত হয়েছে ঠুঁটো জগন্নাথে।

স্বাধীন করে রাখা যায়, তবে রাষ্ট্রের অন্য কোনো বিভাগের অন্যায়, ক্ষমতার অপব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। একের ত্রুটি, একের অন্যায় অপরের দ্বারা সংশোধিত হবার পথ যদি খোলা থাকে তবেই কেবল আইনের শাসন কথাটার একটা মানে থাকে। তাই এ কথা বলা যায়, বুর্জোয়া ব্যবস্থায় সব সীমাবদ্ধতাকে মনে রেখেও যদি ক্ষমতা বিভাজনের তত্ত্বকে প্রয়োগ করে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিশেষত বিচার বিভাগের মধ্যে আপেক্ষিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যায়, তবে এই সমাজেও বিচার যতই ব্যয়বহুল, কষ্টসাধ্য আর সময়সাপেক্ষ হোক না কেন, একজন নাগরিক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ও প্রশাসকের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের দাবি জানাবার তবু একটা জায়গা পায়। এটা না থাকলে সেই ন্যূনতম জায়গাটুকুও আর থাকে না।

সমস্ত প্রতিষ্ঠান সরকারের মুখাপেক্ষী করা ফ্যাসিবাদী শাসনেরই লক্ষণ

সামাজিক চিন্তা গড়ে ওঠার স্বাভাবিক ও একান্ত প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া হলো নানা চিন্তা-মত-পথের নিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ। এটা বাদ দিয়ে কোনো দিন সমাজে নতুন চিন্তা-ভাবনার জন্ম হতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন আপেক্ষিক স্বাধীনতার। সেটা ব্যক্তিগত স্তরে যেমন তেমনি প্রতিষ্ঠানগত দিকেও। কিন্তু সরকারের দমন-পীড়ন থাকলে, সবক্ষেত্রে সরকারের চিন্তাকে প্রয়োগ করার বাধ্যবাধকতা থাকলে কোনো ক্ষেত্রেই এই আকাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক পরিবেশ নির্মিত হতে পারে না। চিন্তা-ভাবনায় স্থবিরতা চলে আসে, রাজনৈতিক শাসনে আসে ফ্যাসিবাদ। বিচারপতিদের মাথায় যদি শাস্তির খড়্গ ঝুলতে থাকে, শাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের যদি সরকারি নিয়মনীতি পালনেরই কেবল বাধ্যবাধকতা থাকে তবে তিন বিভাগের ভারসাম্য (check and balance) কখনোই রক্ষিত হতে পারে না। সবাইকে সরকারের পায়ের কাছে নত হয়েই থাকতে হয়। অবস্থাদৃষ্টে কখনো মনে হয়, এ যেন সেই রাজার শাসন। অথচ রাজা-যাজকদের সামন্ততন্ত্রকে পরাস্ত করে একদিন বুর্জোয়া দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর 'লিবার্টি' গ্রন্থে বলেছিলেন, "যদি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একজন ব্যক্তিও অন্য সকলের সঙ্গে চিন্তায় একমত না হতে পারে, তবে সেই একজনের চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ঠিক তেমনি থাকে, যেমন এই একজনেরও কোনো অধিকার নেই তার একার চিন্তা ও মতকে চাপিয়ে দিয়ে বাকি সকলের কণ্ঠরোধ করার।" এসব আলোচনা আজকে আমাদের কাছে বড় বড় কথা ছাড়া আর কিছুই না! রাষ্ট্র যে মাত্রায় ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠেছে সেখানে ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অবস্থান বারবার আক্রমণের শিকার হচ্ছে। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। নবম শ্রেণির প্রশ্নপত্রে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অবমাননা করা হয়েছে' (যদিও প্রশ্নপত্রের কোথাও নামটা পর্যন্ত উল্লেখ ছিল না) এই মিথ্যা অভিযোগ তুলে চট্টগ্রামের একটি স্কুলের ১৩ জন শিক্ষককে জেলে পাঠানো হয়েছে কিছুদিন আগে। (তথ্যসূত্র : বিবিসি বাংলা) এ যখন অবস্থা তখন ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা কথাটির কোনো মানে থাকে কি?

ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়ে কি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়েছে?

এর আগে অষ্টম সংশোধনী বাতিলের মামলা (হাইকোর্টকে ছয়টি বিভাগীয় শহরে স্থানান্তর) নিয়েও খুব শোরগোল উঠেছিল। সামরিক সরকারের সময়ে প্রণীত সংশোধনী বাতিলের সেই মামলাটি বেশ আলোচিত ছিল। এবারও ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায় নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে। এর বোধহয় একটি বড় কারণ কোনো একটি সরকার ক্ষমতায় থাকতেই তার করা সংশোধনের বিরুদ্ধে আদালতের রায়। আমাদের দেশে এতটুকু গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি তৈরি হয়নি যে, সরকার তা মেনে নেবে। আরও কিছু বিষয় আছে, প্রধান বিচারপতি যেভাবে তাঁর পর্যবেক্ষণে সংসদ, প্রচলিত রাজনীতি এবং প্রতিনিধিত্বহীন নির্বাচনের সমালোচনা করেছেন তাতে সরকারের গাত্রদাহ না হয়ে উপায় নেই। যদিও এসব মতামতের আইনগত মূল্য কতটা তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। কিন্তু তারপরও এমন বন্ধ্যা সময়ে, যখন সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, যখন সামান্য প্রতিবাদ-প্রতিরোধকেও সরকার নস্যাৎ করতে উদ্যত হয়ে উঠছে, সেখানে উচ্চ আদালত থেকে এমন কিছু আলোচনা সরকারকে বিব্রত করেছে বৈকি। তার উপর সরকার প্রধান থেকে শুরু করে মন্ত্রী-এমপিদের বক্তব্য-বিবৃতি এই উত্তপ্ত আলোচনায় ঘি ঢেলেছে, সন্দেহ নেই। একইসাথে প্রধান বিচারপতির দৃশ্যমান অনমনীয় মনোভাবে সরকার যে কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়েছে, তা দেখে অনেকের মধ্যে পুলক ও আশাবাদ তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই রায় আসলে কতটুকু কার্যকরী হবে?

সরকারের দিক থেকে এখনও রিভিউ নেবার সুযোগ বাকী আছে। আদালতকে চাপ প্রয়োগ করে বিপরীত কিছু করার সম্ভাবনাকে নাকচ করা যায় না। আবার ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করে সপ্তদশ সংশোধনী সংসদে পাশ করা হবে কিনা – তা নিয়েও তৈরি করা হয়েছে সংশয়। তারপরও রায়কে ঘিরে আরও কিছু বিষয় আছে, যা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। যেমন –

- সংশোধনী বাতিলের রায়ের মাধ্যমে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে অবিকল ফিরিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু এরও দুর্বল দিক আছে। এই কাউন্সিল আসলে প্রধানমন্ত্রীর পূর্বানুমোদন ছাড়া কারও বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্তই শুরু করতে পারবে না। এ সম্পর্কে রায়ে কোনো পর্যবেক্ষণ নেই।

- উচ্চতর আদালতের বিচারক অপসারণের ক্ষমতা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে দেয়া হলেও নিম্ন কোর্টের কী হবে? অথচ নিম্ন কোর্ট উচ্চতর কোর্টের চেয়ে ১৫ গুণ বেশি মামলা পরিচালনা করে। অনুচ্ছেদ ১১৬-তে বলা হয়েছে 'বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল-নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরিসহ) ও শৃঙ্খলাবিধান রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকবে।' এই যদি হয় অবস্থা তাহলে নিম্ন আদালতে কীভাবে নিরপেক্ষতা মেনে, সরকারি চাপ উপেক্ষা করে বিচারকার্য করা সম্ভব? ১১৬ অনুচ্ছেদ বাতিল না করে কি বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে সামগ্রিকভাবে দেখা হলো?

- অধস্তন আদালত ও উচ্চ আদালতের বিচারকরা অবসরে গেলে সরকারি সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করবেন কি না বা সেই সময় সরকারের সাথে বিচার বিভাগের সম্পর্ক কেমন হবে – সে সম্পর্কে রায়ে কোনো আলোচনা নেই।

- আলোচ্য রায়ে ৭০ অনুচ্ছেদ (কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোন *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সরকারের কর্তৃত্বকারী ভূমিকার নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি উক্ত দল থেকে পদত্যাগ করেন অথবা দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন তাহলে সংসদে তার আসন শূণ্য হবে) নিয়ে অনেক সমালোচনা হলেও এরকম একটি একটি কালো আইন যে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার সাথেই সাংঘর্ষিক এবং বাতিলযোগ্য – ব্যাপারটা সেভাবে আসেনি। যদিও ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের অন্যতম কারণ হিসেবে ৭০ অনুচ্ছেদকে আনা হয়েছে, কিন্তু এই অগণতান্ত্রিক বিধানটি সংবিধানে রয়েই গেল। এ কারণে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার উৎস প্রধানমন্ত্রী রয়ে গেলেন। এর মাধ্যমে আর যাই হোক, ক্ষমতার বিভাজন তত্ত্ব কার্যকর হতে পারে না। একইভাবে পারে না বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত হতে।

বাহাত্তরের সংবিধানের দোহাই

ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায় যেদিন দেয়া হয়, সেদিন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'আমাদের স্বপ্ন ছিল বাহাত্তরের আদি সংবিধানে ফেরার। কিন্তু এই রায়ের মধ্য দিয়ে আমাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হলো না। এজন্য আমরা দুঃখ ও হতাশা প্রকাশ করছি।' বাস্তবতা হলো, এভাবে কথায় কথায় বাহাত্তরের সংবিধানে ফেরত যাবার কথা বলা এক ধরনের ভাওতাবাজি। বাহাত্তরের সংবিধানে ৩৮ অনুচ্ছেদের মধ্য দিয়ে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু এই ধারা ফিরে আসলেও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি সরকার বন্ধ করেনি। সংবিধানে একইসাথে সেক্যুলারিজম এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম আছে। যা একসাথে থাকতে পারে না। আবার বাহাত্তরের মূল সংবিধানে ১১৬ নং অনুচ্ছেদে বলা ছিল, 'নিম্নতম আদালতের সমস্ত কিছু উচ্চতর আদালতের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।' সেটা এখন আছে পুরোপুরি সরকারের হাতে। এভাবে প্রতিনিয়ত বাহাত্তরের সংবিধানের বিপরীতে হাঁটলেও সরকার কেবল ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের সময় কতগুলো কথা নিয়ে আসছে।

সমাধান কোথায়?

ষোড়শ সংশোধনী আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখলাম অনেকগুলো বিতর্কিত বিষয় এসেছে। একদিকে বিচার বিভাগের আপেক্ষিক স্বাধীনতার কথা এসেছে, যেটি না হলে সুষ্ঠু বিচার সম্ভব না। আবার দেখা যাচ্ছে আইন বিভাগের প্রধান 'প্রধানমন্ত্রী'র হাতেই সব ক্ষমতা আবদ্ধ। একদিকে প্রধান বিচাপতিকে যা ইচ্ছা তাই বলা যাচ্ছে, অন্যদিকে 'বিচার বিভাগকে সমুন্নত' রাখার কথা বলে দলীয় সরকারের নেতৃত্বেই নির্বাচন হচ্ছে। আবার আমরা দেখছি উচ্চ আদালতের বিচারক অপসারণ ত্রুটিপূর্ণ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে থাকলেও নিম্ন আদালত থাকছে সরকারের নিয়ন্ত্রণে। এই যখন অবস্থা তখন উপায় কী? এই উত্তর পেতে হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লিপসন তাঁর 'গ্রেট ইস্যুস অব পলিটিক্স' গ্রন্থে যা বলেছেন তা বুঝতে হবে – "আইন রাজনীতিকে নির্ধারণ করে না বরং প্রধানত রাজনীতিই আইনকে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। আইনের শাসন ও গঠনতান্ত্রিক শাসনের প্রতি মর্যাদাবোধ রাজনীতিগতভাবে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে না বরং স্বাধীনতার মর্যাদার ভিত্তিতে যে রাজনীতি সেটাই আইনের শাসন বা সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে তোলে। তাই যাকে বলা হয় 'আইনের মুক্ত আকাশ' সেটা স্বনির্ভর নয় – রাজনীতির চরিত্রের উপর তা দাঁড়িয়ে থাকে।" অর্থাৎ আইন-আদালত যা কিছু নিয়েই আমরা আলোচনা করি না কেন, কোন শক্তির হাতে রাজনীতি – তা আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে। জাতীয় সংসদে কারা বসে আছে – তা দিয়েও আমাদের সংবিধানের পরিবর্তনগুলোকে বুঝতে হবে। ষোড়শ সংশোধনীর আলোচনাও এই প্রেক্ষাপটের বাইরে নয়।

আমরা সুস্পষ্টভাবেই জানি, কারা আমাদের দেশকে পরিচালনা করছে। সংসদে যে ৩৫০ জন সদস্য আছেন তারা কোটি কোটি টাকার মালিক। তাদের হাত ধরেই এ দেশ থেকে গত বছর ৭৪ লক্ষ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। সংসদে বসা বেশিরভাগ সদস্যদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি-ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ আছে। এরা এ দেশের ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধি। এই শ্রেণির নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছিল বলে স্বাধীনতার পরে সংবিধানে 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারগুলো' মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। এরা গত ৪৬ বছরে সংবিধানে যতটুকু ভালো কথা লেখা রয়েছে তার বাস্তবায়ন ঘটায়নি। এদের হাতে পড়ে সংবিধান ১৬ বার কাঁটাছেঁড়া হয়েছে কিন্তু তাতে জনগণের স্বার্থের কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। ফলে এই রাজনৈতিক শক্তির হাতে যখন দেশের আইন-বিচার ব্যবস্থা পড়ে তখন তার পরিণতি কী হবে – সেটা খুব সহজেই বোঝা যায়।

তবুও আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলছি কেন? এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য খুব পরিষ্কার। এই বুর্জোয়া ব্যবস্থায় পরিচালিত সংবিধান জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারবে না। এই সত্য ভাষণটি আমরা জনগণের মধ্যে নিয়ে যেতে চাই বারবার। কিন্তু তারপরও সংবিধানের মধ্যে রাষ্ট্রের তিনটি স্তম্ভের মধ্যে সম্পর্ক, আপক্ষিক স্বাধীনতা এবং জনগণের স্বার্থে পরিচালনার যে ন্যূনতম সুযোগটি থাকে তাকে অক্ষুণ্ন রাখার কথাও আমরা বলব। এই স্বাধীনতার জায়গাটুকু খর্ব করলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব। পাশাপাশি দেশের সকল প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটানোর দাবিও আমরা তুলেছি। মতামত প্রকাশের অধিকার এবং তেমন স্বাধীন পরিবেশ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষাও সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই। কেননা আমরা জানি, এই ব্যবস্থার পক্ষে জনগণকে পূর্ণাঙ্গরূপে গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদান করা আর সম্ভব নয়। অথচ মানুষ চাইছে আরও উন্নত সামাজিক ব্যবস্থা। এই যে বিরোধ, তার পথ বেয়েই এবং তার সঙ্গে ছেদ টেনেই স্বাধীনতা ও অধিকারের পূর্ণতা অর্জনের সংগ্রাম মানুষকে নিয়ে যাবে উন্নততর সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দিকে। আমাদের সকল সংগ্রাম সে পথেই ধাবিত করতে হবে। সেটাই আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই আমরা কাজ করছি।

এ সমাজে নারীর অবস্থান কোথায়?

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বিস্তার এমন ধর্ষক আর খুনি তৈরির জমিন তৈরি করছে প্রতিদিন।

সবচেয়ে বড় ব্যাপারটি হলো মুষ্টিমেয় বড়লোকের স্বার্থে পরিচালিত এ সমাজে শাসকশ্রেণি এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার নতুন মন্ত্র আবিষ্কার করেছে। এজন্য ছোট বয়স থেকেই চলছে নীতি-নৈতিকতা-মূল্যবোধ-মনুষ্যত্ব ধ্বংসের নানা আয়োজন। দেশব্যাপী আজ পর্নোগ্রাফির রমরমা ব্যবসা চলছে। নাটক-সিনেমা-বিজ্ঞাপনে নারীকে পণ্যরূপে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ছোটকাল থেকেই এসব দেখে দেখে তরুণ-যুবকদের দৃষ্টিভঙ্গিটাই গড়ে উঠছে ভিন্নরকম হয়ে। অন্যায় আজ আর তাদের কাছে অন্যায় নয়। ন্যায়-অন্যায় বিচারের বোধটা পর্যন্ত ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। ভোগবাদকে উস্কে দেয়া হচ্ছে। আর সে ভোগবাদ মানুষকে অমানুষ করে তুলছে। আনন্দ এখন বিভৎসতায় রূপ নিয়েছে। আর এ বিভৎসতার শিকার হলেন রূপা। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, রাস্তা থেকে বাসস্ট্যান্ড, অফিস থেকে পাড়ার দোকান, রেস্টুরেন্ট সর্বত্রই চলছে বিভৎসতা। কোনো নীতি-নৈতিকতা-মূল্যবোধের ব্যাপার নেই, স্ফূর্তিই যেন জীবনের উদ্দেশ্য। তার জন্য উত্তেজনা চাই। দেশজুড়ে তাই বিভিন্ন নেশাদ্রব্যের রমরমা ব্যবসা। এই সমস্ত কিছু নিয়ে যে প্রজন্ম গড়ে উঠছে সে প্রজন্ম মেয়েদের কোন দৃষ্টিতে দেখবে, তা বলাই বাহুল্য।

রূপার খুনিরা ধরা পড়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের শাস্তি হবে কিনা আমরা জানি না। এই সংশয় এমনি এমনি তৈরি হয়নি। অতীতেও এমন বহু ঘটনা ঘটেছে, অপরাধীরা শাস্তি পায়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অপরাধীরা সরকার দলীয় কেউ। ফলে তারা পার পেয়ে গেছে। এই যখন অবস্থা তখন রূপার মতো মেয়েদের এমন পরিণতি আমাদের আরও ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারে। আমাদের মা-বোন-স্ত্রী-স্বজন নিয়ে আমরা আরও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারি, আরও সংকুচিত হয়ে পড়তে পারি। কিন্তু এর কোনোটাই বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাবে না। আমাদের প্রত্যেকের সরব-সচেতন ভূমিকা ছাড়া দুর্বৃত্তদের এমন নৃশংসতা কমবে না। এই ভূমিকা দরকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-অফিস-আদালত-কারখানা সব জায়গায়। ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে লড়াই বিস্তৃত করার মধ্য দিয়েই আমরা কেবল শ্বাস নিতে পারব, বেঁচে থাকার মর্যাদাটুকু রক্ষা করতে পারব। রূপার মর্মান্তিক পরিণতি, তাকে হারানোর শোক আমাদের মধ্যে যেন সেই শক্তির জাগরণ ঘটায়।

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধের দাবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্কের বিপত্তি ঘটাবে। সুন্দরবন ধ্বংস হলে ওই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সুরক্ষা ও স্থানীয় জীবনযাত্রা ভেঙ্গে পড়বে। ...কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০৪১ সালের মধ্যে বর্তমান ৩ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশে উন্নীত করার সরকারি ঘোষণার সমালোচনা করে বলা হয়, এতে পরিবেশ ও প্রযুক্তিগত বিকাশকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। বার্লিন ঘোষণায় ২০৪১ সালের মধ্যে ৫৫ শতাংশ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদনের যে পরিকল্পনা জাতীয় কমিটি দিয়েছে, তার প্রতি সমর্থন জানানো হয়। বার্লিন ঘোষণায় সমর্থন জানিয়ে ১০৩টি সংগঠন ও ব্যক্তি স্বাক্ষর করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে গ্রিন পিস, ফ্রেন্ডস অব দা আর্থ, ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড ফাউন্ডেশন, থ্রি ফিফটি, লন্ডন মাইনিং নেটওয়ার্ক, কোল একশন নেটওয়ার্ক ইউকে,উইমেন ইনগেইজ ফরদি কমন ফিউচার, ব্যাংক ট্র্যাক, আর্থ ফরএভার ফাউন্ডেশন, ফয়েল ভেডান্ট, ম্যানগ্রোভ একশন গ্রুপ ইউএসএ, ওয়ার্ল্ড লাইফ ইমপ্যাক্ট, জার্মান রিসার্চ সেন্টর ফর জিও সায়েন্স, উইমেন আফ্রিকান এলায়েন্স, ফেমিনিস্ট নেটওয়ার্ক নেপাল, ক্লাইমেট এলায়েন্স জার্মানি ইত্যাদি।

সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে সুন্দরবন অঞ্চলে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল ও বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্ভাব্যতা নিয়ে আন্দোলন ও সংহতি প্রকাশের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা প্রতিনিধিদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন জার্মানির বাবুল সৈয়দ, যুক্তরাজ্যের ডা. মুখলিছুর রহমান, ড. আখতার সোবহান মাসরুর, ডা. রফিকুল হাসান, গোলাম কবির, ডা. সেলিম ভূঁইয়া ও ডা. সাহিদা সুলতানা, ইটালির শিপলু আহাত শামুল, ফ্রান্সের নিলয় সূত্রধর সুমন, সুইডেনের বসিত চৌধুরী, নরওয়ের আশরাফুল হক আবির ও নেদারল্যান্ডসের অনুপম সৈকত শান্ত প্রমুখ।

এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহকে নিয়ে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির ইউরোপীয় শাখা গঠন করা হয়। ইউরোপীয় শাখার সমন্বয়ক নির্বাচিত হন মোস্তফা ফারুক। জাতীয় কমিটির আন্দোলনের পক্ষে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে জনমত গড়ে তোলা, ইউরোপের রাজনৈতিক-সামাজিক শক্তিসমূহের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও বিভিন্ন দেশে গড়ে ওঠা জাতীয় কমিটির কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ইউরোপীয় শাখা কাজ করবে।

ফ্যাসিবাদী মনোভাব উন্মোচিত হয়েছে

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের অনুগত প্রতিষ্ঠান হিসাবেই দেখতে চায়। এই সব চিন্তা ও তৎপরতার সাথে প্রকৃত প্রস্তাবে আইনের শাসনের কোনো সম্পর্ক নেই।

সংবাদ সম্মেলনে আরো বলা হয়, গত ৩রা জুলাই আপিল বিভাগ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায় দেশের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। সর্বোচ্চ আদালতের এই রায় বা পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে সরকার বা সরকারি দলের যদি কোনো ভিন্নমত বা আপত্তি থাকে তা জানানো অথবা 'রিভিউ' চাওয়ারও আইনত বিধিবিধান রয়েছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, উচ্চ আদালতের রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বা আইনের শাসনের প্রতি যদি সরকারের নূন্যতম কোনো অঙ্গীকার অবশিষ্ট থাকে তাহলে সরকার প্রথাগত আইনী পথেই তাদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারতেন। তা না করে সরকার ও সরকারি দল, মন্ত্রীবর্গ, তাদের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ ও তাদের আইনজীবীরা যেভাবে এই রায়, রায়ের পর্যবেক্ষণ, উচ্চ আদালত, এমনকি মাননীয় প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আক্রমণাত্মক বক্তব্য ও তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন তা উচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণার সামিল। আইনসিদ্ধ পথে না হেঁটে যুদ্ধাংদেহী মনোভাব নিয়ে উচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে তারা যেভাবে তোপ দাগছেন তা বাংলাদেশে স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিচার ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাতের সামিল। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার নেতৃবৃন্দ।

চলন্ত বাসে গণধর্ষণ ও হত্যা
এ সমাজে নারীর অবস্থান কোথায়?

অনেক গল্প আমরা শুনি প্রতিদিন। ব্যাথার গল্প, ব্যর্থতার গল্প, অপমানের গল্প এ সমাজে তৈরি হচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই। আমাদের আজকের গল্পটা এসব থেকে আলাদা। ছেচল্লিশ বছর আগে যে জাতি প্রবল আবেগে, বিপুল গৌরবে পরাধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার লড়াই করেছিল নতুন দেশ নতুন মানুষ গড়বে বলে – সে জাতি আজ প্রতিদিন কেমন মানুষ সৃষ্টি করছে? এ সমাজকে কি আজ চেনা যায়? সেই গল্প শোনা যাক আজ। গল্পটি এদেশেরই একটা মেয়েকে নিয়ে, তার নাম রূপা।

মাস্টার্স পাশ করে একটা কর্পোরেট অফিসে চাকুরি করত রূপা। জীবনের বহু পথ পাড়ি দিয়ে একটু একটু করে নিজেকে বড় করেছিল সে। ছোটবেলায় হারিয়েছিল বাবাকে। বাবা হারানোর কষ্ট আর দারিদ্র্যের প্রবল কষাঘাত তাকে দমাতে পারেনি। শুধু নিজে নয়, পড়াশুনা করিয়েছিল ছোট বোনকেও। ঈদের আগে চাকুরিতে বেতন বেড়েছিল। দারুণ আনন্দে ভেবেছিল এবার ঈদে বাড়িতে গিয়ে মাকে চমকে দেবে। মাও খুব খুশি হবেন। বাপমরা মেয়েটিই তো পরিবারের অন্যতম সম্বল। কিন্তু মায়ের সাথে সুখের মুহূর্তটি আর এলো না। মেয়ে ফিরলো বাড়িতে, কিন্তু নিথর দেহে। শোকে পাগলপ্রায় মা হাসপাতালের বেডে চিৎকার করে বলেছেন, 'আমার দরদী বেটি। কত কষ্ট করে যে লেখাপড়া শিখেছে।' মায়ের এই বিলাপ পাষাণ হৃদয়েও ঝড় তুলবে। মৃত্যু কষ্ট দেয়। জন্ম নিলে মানুষকে মরতে হবে ঠিক। কিন্তু এমন মৃত্যু কে চেয়েছিল? এমন যন্ত্রণা আর অপমানের মরণ কেন রূপার মতো মেয়েদের জীবনে আসে?

গত ২৫ আগস্ট রূপা উঠেছিল বগুড়া থেকে ময়মনসিংহগামী একটি বাসে। সেদিন কোনো কারণে বাসে যাত্রী কম ছিল। একসময় সে-ই হয় একমাত্র যাত্রী। বাসে স্টাফ ছিল মোট ৫ জন। তারা সবাই মিলে রূপাকে গণধর্ষণ করে, একসময় আত্মরক্ষায় চিৎকার করলে রূপাকে ঘাড় মটকে তারা মেরে ফেলে। লাশ ফেলে দেয় টাঙ্গাইলের কাছে মধুপুরে। এমন নৃশংসতার সম্পূর্ণ বিবরণ অসম্ভব। ন্যূনতম বিবেকসম্পন্ন মানুষ এমন ঘটনায় শিউরে উঠবেন, উঠেছেনও। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হলো, যারা এই অপকর্মটি করলো, তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র বিকার দেখা যায়নি। যেন খুবই স্বাভাবিক একটা কাজ করেছে তারা। এমনকি তারা পরেরদিন গাড়ি চালিয়েছে, স্বাভাবিক কাজকর্ম করেছে। এ কীভাবে সম্ভব? কেমন করে মানুষ এমন পাশবিক আর হৃদয়হীন হতে পারে? প্রবৃত্তির লালসা কি তাদের সমস্ত মানবিক অনুভূতিকে নিঃশেষ করে দিয়েছে?

রূপার মতোই তনু, ত্বকী, সাগর, রুনীসহ আরও অসংখ্য মানুষকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। শিশুদের সংখ্যাও কম নয়। প্রতিদিন নারীরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, ঘরে-বাইরে নারী নির্যাতনের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। নিষ্ঠুর নৃশংসতা তৈরি হচ্ছে সমাজে, প্রতিদিন জন্ম নিচ্ছে ধর্ষক আর খুনিরা। জন্ম দিচ্ছে এই সমাজ। অর্থনৈতিকভাবে প্রবল বৈষম্য, রাষ্ট্রের ফ্যাসিবাদী আচরণ, গুম-খুন-ক্রসফায়ার সবই সমাজে চরম আধিপত্যের মনস্তত্ব তৈরি করছে। এই আধিপত্য সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের, দুর্বলের উপর সবলের, নারীদের উপর পুরুষতন্ত্রের। সমাজ পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক অশ্রদ্ধা, হিংসা, ক্ষমতা দখলের লড়াই, অর্থ-বিত্তের প্রতাপ আর উন্মত্ত যৌনতার *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

রক্তে লেখা ফুলবাড়ী বিদ্রোহের ইতিহাস ভোলা যায় না

২৬ আগস্ট, ২০০৬। উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত যেন ঘটেছিল সবুজে ঘেরা ফুলবাড়ীতে। দিনাজপুরের ফুলবাড়ী। ফুলবাড়ীর মাটির নীচে আছে উন্নত কয়লা। বিস্ফোরণটা কয়লার ছিল না, ছিল মানুষের ক্ষোভের। লোভী শাসকরা অধিক মুনাফার আশায় এক অসম চুক্তিতে কয়লা তুলে দিতে চেয়েছিল এশিয়া এনার্জি নামের একটি কোম্পানির হাতে। যারা চেয়েছিল উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা তুলতে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে উচ্ছেদ করে। এই অন্যায্য তৎপরতা মানতে পারেনি ফুলবাড়ীর সাধারণ মানুষ। ২৬ আগস্ট ছিল মহাসমাবেশ। সেদিন সংগ্রামী মানুষের ইস্পাতদৃঢ় শক্তিকে চিনেছিল শাসকের রক্তচক্ষু। হাজার হাজার নারী-পুরুষ, হাতে লাঠি-বটি-স্যাণ্ডেল নিয়ে ভয়হীন তীব্র চাহনি নিয়ে তাকিয়েছিল পুলিশ-বিডিআরের আধুনিক অস্ত্রের দিকে। ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল জান্তার দল। বাপ-দাদার ভিটেমাটি আর সোনার ফসল ফলা জমি থেকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল শাসকরা। তাই দেখে মানুষ সেদিন দাঁড়িয়েছিল সম্পদ আর মর্যাদা রক্ষার কঠিন শপথে। কে ছিল না সেই মিছিলে? শিশু থেকে বয়স্ক, ছাত্র থেকে শ্রমজীবী, শিক্ষক থেকে কৃষক। পরিস্থিতি দেখে তৎকালীন বিএনপি-জামাত জোট সরকার শহরে জারি করেছিল কারফিউ, লেলিয়ে দিয়েছিল পেটোয়া বাহিনীকে, চালিয়েছিল গুলি। রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল ফুলবাড়ির সবুজ ভূমি। বহু জীবনের দামে স্বাধীনতা এনেছে যে জাতি, প্রাণত্যাগে তার ভয় ছিল না। তাই তরিকুল, আলামীন, সালেকীনের প্রাণহীন নিথর দেহ নিয়েই এগিয়ে গিয়েছিল সংগ্রামী জনতার ঢল। আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশে।

এমন তীব্র জনরোষ আটকানোর সামর্থ্য কোনো শাসকেরই থাকে না। তখনকার সরকারেরও ছিল না। তারা নতি স্বীকার করল। এশিয়া এনার্জিকে বহিষ্কার করা, হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের শাস্তি, ক্ষতিপূরণ দেয়া, উন্মুক্ত পদ্ধতিতে *(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বার্লিন সম্মেলন থেকে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধের দাবি

জার্মানির রাজধানী বার্লিনে গত ১৯ ও ২০ আগস্ট দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সুন্দরবন সংহতি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক এক ইউরোপিয় সম্মেলন। বাংলাদেশ সরকার ভারতের সাথে যৌথ উদ্যোগে সুন্দরবনের কাছে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের যে পরিকল্পনা নিয়েছে, তা নিয়ে উদ্বেগ দুনিয়ার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ ও বসবাসরত বাংলাদেশি জনগোষ্ঠী।

ইউরোপের বিভিন্ন শহরে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে সমন্বয়ের প্রয়োজন থেকে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি'র ইউরোপীয় একশন গ্রুপের আহ্বানে বার্লিন শহরের হাউস অব ডেমোক্র্যাসি'র এক হলে অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলন। সম্মেলনে জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইটালি, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে ও সুইডেন থেকে ৮০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। সম্মেলনে জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন। অংশ নেন তেল-গ্যাস রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। তিনি বলেন, 'রামপাল প্রকল্প কেবল সুন্দরবন ধ্বংস করবে না, তা বাংলাদেশ-ভারতের আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে একটি স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করবে।' তিনি জ্বালানিসহ জনসম্পদের উপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন।

দুদিনব্যাপী এ কনভেনশনে মোট আটটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, জার্মানির হুমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ভিলফ্রেড এন্ডলিসার, কোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হার্টমুট বেরভোল্ফ, গ্রিনপিসের ক্রিসটিন ডোরেনব্রুক, লাইবনিজ ভূপদার্থবিদ্যা ইনস্টিটিউটের গবেষক ড. আজিজুর রহমান, বিকল্প জ্বালানি গবেষক মাহবুব সুমন, জার্মান পরিবেশ ফোরামের এলিজাবেথ স্টাউড, পরিবেশ সাংবাদিক ক্যাথরিন ফিঙ্কে, ডেভিড ওয়েন্ড ও ভারতের পিপলস সায়েন্সের ড. সৌম্য দত্ত। বিভিন্ন পর্বে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন দেবাশীষ সরকার, ড. অনিমেষ গাইন, তানজিয়া ইসলাম ও ওয়াহেদ চৌধুরী।

কনভেনশনের শেষ অধিবেশনে বার্লিন ঘোষণা গৃহীত হয়। বার্লিন ঘোষণায় অবিলম্বে সুন্দরবনের পাশে কয়লাভিত্তিক ভারত-বাংলাদেশ যৌথ রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধের আহ্বান জানানো হয়। ঘোষণায় বলা হয় যে, রামপাল প্রকল্প প্রজাতি ও প্রতিবেশ ধ্বংস করে মানুষ ও *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বাসদ (মার্কসবাদী) এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ত্রাণ সহযোগিতার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান, সহযোগিতা করুন।

সহযোগিতার জন্য
মোবাইল নম্বর - ০১৮১৯৫৪৫৯৭৫
বিকাশ নম্বর - ০১৭৫৭৮০৮৭৮১

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org । ই-মেইল : mail@spbm.org